Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : মানবিকতা ও সামগ্রিকতার শিল্পভাষ্য

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Qudrat-E-Huda
Published online	October 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v50i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.7
Pages	১৬৫-১৭৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : মানবিকতা ও সামগ্রিকতার শিল্পভাষ্য

Check for updates

মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এটি কেবল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জনের কারণে তাৎপর্যপূর্ণ তা নয়, বরং এটি একটি জনগোষ্ঠীর সত্তার আবিষ্কার এবং নির্মাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত নানা আন্দোলন-সংগ্রাম পূর্ববাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিসত্তার আকাঙ্ক্ষার যে অস্পষ্ট রূপাবয়ব তৈরি করেছিল, তা-ই ১৯৭১ সালে স্পষ্টতা পায়। নতুন পরিস্থিতিতে বাঙালির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ একটি স্পষ্ট আদল বা রূপরেখায় ধরা পড়ে। বাঙালির মধ্যে জন্ম নেয় শোষণহীন, উদার-গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক এবং একই সঙ্গে বিপ্লবের স্পন্দনে স্পন্দিত এক রাষ্ট্রের বাসনা। এই নতুন রাষ্ট্রের বাসনা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কতটা পূরণ হয়েছে সেটি ভিন্ন বিতর্ক, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে যে জনগণীয় বাসনা তৈরি হয়েছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপক অংশ অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। তাদের মনে নতুন যুগের স্বাভাবিক আশা জেগেছিল। এই 'নতুন যুগের আশা' এবং নবতর রাষ্ট্রীয় বাসনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপরেখা যে-ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার অনন্যতা অনস্বীকার্য। ফলে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কেবল ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মদান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা, নারীর সম্ভ্রমহানির নির্মম আলেখ্য নয়, তারও অতিরিক্ত কিছু। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, আদর্শ, সমাগম, ব্যাপ্তি, গভীরতা, ধ্বংস, সৃজন—এসব কেবল মহাকাব্যের আয়োজনের সঙ্গেই তুলনীয়। আহমদ ছফা যথার্থই বলেছেন—

> ইতিহাসে কোন কোন সময় আসে যখন এক একটা মিনিটের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং ঘনত্ব হাজার বছরকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদের জীবনে একাত্তর সাল সে রকম। ... কারণ একাত্তর সালে যা কিছু ঘটেছে, আমি যা কিছু দেখেছি ... আমার জাতির যে জাগরণ, যে প্রতিরোধ, যে দৃঢ় সংকল্প; মৃত্যুর যে সরল প্রস্তুতি, জয়ের যে নেশা, যে আত্মত্যাগ, যে বোকামি এবং উন্মাদনা আমি দেখেছি—সবকিছুকে একটা বিরাট সত্তার অবিভাজ্য অংশ মনে হয়। চোখ বুজে একাত্তরের কথা চিন্তা করলে আমার কানে মহাসিন্ধুর কল্লোল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে (আহমদ, ২০০৭ : ২৫)।

বাঙালি জাতিসত্তার এই ইতিহাস সমকালীন এবং উত্তরকালীন সৃষ্টিশীল সত্তাকে আলোড়িত এবং দায়বদ্ধ করবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ কোনো শিল্পী-সত্তাই দেশ-কাল-ইতিহাসনিরপেক্ষ নয়। সংগত কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও এ-দেশের শিল্পের সবগুলো শাখার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। উপন্যাসশিল্পেও মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব-প্রেরণা

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ।

নিতান্ত কম নয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস লিখিত হয়েই চলেছে। এ-যাবৎ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে যেগুলো বহুশ্রুত, পঠিত ও আলোচিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — শওকত ওসমানের *জাহান্নম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *জলাংগী* (১৯৭৪); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *একটি কালো মেয়ের কথা* (১৯৭১); আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩); রশীদ করীমের *আমার যত গ্লানি* (১৯৭৩); রাবেয়া খাতুনের *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৪); রশীদ হায়দারের *খাঁচায়;* শওকত আলীর *যাত্রা;* (১৯৭৫); মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬); সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬); সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১), *নীলদংশন* (১৯৮১) এবং আহমদ ছফার *অলাতচক্র* (১৯৯০)। প্রত্যেকটি উপন্যাসই আকারে ছোট এবং প্রকরণে প্রায় সমধর্মী। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এসব উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু মতামত দেখে নেয়া যেতে পারে। কারণ এসব মতামতের ভিত্তিতে হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের আলোচনা হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

> (ক) বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে অথচ এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তিরিশ বছরেও কোন মহৎ সাহিত্যের জন্ম দেয় নাই। এই ধরনের নালিশ সর্বৈব ভিত্তিহীন এমন কথা বলার সাহস আমার নাই (সলিমুল্লাহ, ২০০৭ :১৬৮)।
>
> (খ) যুদ্ধরত সমগ্র জাতিসত্তার প্রাণস্পন্দনকে শিল্পমণ্ডিত করতে গেলে যে গভীর জীবনাসক্তি এবং শৈল্পিক নিরাসক্তি প্রয়োজন, কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে আমাদের উপন্যাসে সেই অনিবার্য সমন্বয় তেমন লক্ষ করা যায় না (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৩১২)।
>
> (গ) আসলে বাঙালি জাতির জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে মহাকাব্যোচিত সার্বিক ও যথাযথ উপন্যাস রচনার কাজে কোন কথাশিল্পী এখনো এগিয়ে আসার সাহস করেন নি, যেখানে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাবলির যথার্থ সমাদর করা হবে (সৌমিত্র, ২০০৬ : ২৮)।
>
> (ঘ) বাঙালী জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অসামান্য দিক মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ অবধি যে ক'টি উপন্যাস রচিত হয়েছে তার সব ক'টিই পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক বিশালতা পায়নি। বরং খণ্ড খণ্ড উপাখ্যানের চিত্রণ হিসেবেই তা মূল্যায়িত হতে পারে (শেখ ফিরোজ, ১৯৯১ : ১০০)।
>
> (ঙ) আমাদের কথাসাহিত্যিকেরা মুক্তিযুদ্ধকে অনেকটা বলাৎকারের উপাখ্যানে পরিণত করেছেন (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৯ : ৭০)।
>
> (চ) মুক্তিযুদ্ধের লেখক স্বাধীনতার মহত্ত্ব আবিষ্কারে আজ ক্লান্ত। ... এই জন্যেই মুক্তিযুদ্ধে যে যা দেখেছেন লিখে ফেলেছেন, লক্ষ লক্ষ বুলেট নিক্ষেপ করেছেন কাগজে, ক্রাইম স্টোরি লেখার মতো করে কিন্তু সেই অসম্ভব কষ্টকর, নিদারুণ যন্ত্রণার পথটা দিয়ে এ পর্যন্ত কেউ যান নি। এই পথে আছে বাংলাদেশের বাইশ বছরের ইতিহাস, বাইশ বছরের রাজনীতি, মানুষের ক্ষোভ হতাশা ক্রোধ আর বিদ্রোহ, আছে আট কোটি মানুষের তপ্ত রক্তের সর্বনাশা বন্যা, আছে কোটি কোটি মানুষের নিদারুণ দেশত্যাগের অপমান আর বর্ণনাতীত দুঃখ, আছে দাউ দাউ করে পুড়ে-যাওয়া অগণিত মানুষের খেতখামার, বাড়িঘরের তপ্ত চিহ্ন, লক্ষ লক্ষ নরহত্যার তাণ্ডব, লক্ষ লক্ষ বলাৎকারের পাপ আর আছে এক বিশাল ক্রোধের অগ্নি যা থেকে জন্ম হলো বাংলাদেশের। সেই মহৎপ্রাপ্তি আর বিশাল প্রবঞ্চনার ইতিহাস কেউ লেখেন নি (হাসান আজিজুল, ১৯৯৪ : ৩০)।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে হুমায়ূন আহমেদের পরে শওকত ওসমানই একমাত্র ঔপন্যাসিক, যিনি সর্বাধিক সংখ্যক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচনা করেছেন। শওকত ওসমানের উপন্যাসগুলো নিয়ে যখন সমালোচকেরা উপর্যুক্ত ঘরানার বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তখন শওকত ওসমান নিজে এসব 'নিন্দার কথা' এবং তাঁর 'সুরের অপূর্ণতার' কথা অকপটে মেনে নিয়েছেন। শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো সম্পর্কে তাঁর নিজের ব্যাখ্যাটি এখানে প্রণিধানযোগ্য—

> আবেগের তোড়ে নয়, তখন এইভাবে ভেবেছিলাম যে, সিরিজ করে আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে ধরা। কিন্তু দেখলাম এইভাবে হবে না, অন্যভাবে এটাকে করতে হবে এবং বিরাট ক্যানভাস নিয়েই সেটা সম্ভব। এগুলো যা করেছি সেগুলো খামচি, বাস্তবকে খামচি দেয়া বলতে পার। এসব রচনা করে আমি নিজেই খুব অতৃপ্ত মনে করছিলাম। ভেবেছিলাম পরে বড় করে উপন্যাস লিখব। অনেক সময় যেসব ঘটনা নিজের সামনে দিয়ে যায়, ঠিক ধরা হয় না আর কি, সে জন্যেই এসব চেষ্টা, এগুলো ধরে রাখার জন্যে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা তো বিরাট ব্যাপার।...আসলে এই বিরাট ব্যাপারে নানা পেশা ও শ্রেণির মানুষের ইনভলবমেন্টটাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে তা খণ্ড চিত্র হতে বাধ্য। আমাদেরগুলো (আমেরিকার সিভিল ওয়ার নিয়ে লেখা *গন উইথ দ্য উইন্ড*, ফ্রান্স ও জার্মানির লড়াই নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলো, *ওয়ার এন্ড পিস* ইত্যাদি উপন্যাসের তুলনায়) খণ্ডচিত্রই—ছোট উপন্যাস বা উপন্যাসিকা বলতে পারি (উদ্ধৃত, সৌমিত্র, ২০০৮ : ১৮)।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখনো কোনো মহৎ উপন্যাস রচিত হয়নি। কারণ যে-মহোত্তর জীবনচেতনা এবং রাষ্ট্রচেতনাকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোতে সত্যিই অনুপস্থিত থেকে গিয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের অধিকাংশ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস সম্পর্কেও একথা সত্য। তবে হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, উপন্যাসে এমন কিছু মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, যা অন্যরা করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে হুমায়ূনের সেই বিশেষত্বগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করা হবে।

দুই

হুমায়ূন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের মানস-কাঠামো আর হুমায়ূন আহমেদের মানস-কাঠামো ছিল সমার্থক। আবাল্য তিনি ছিলেন রাজনীতি থেকে দূরে, আর ছিলেন শিল্প-সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের অত্যন্ত কাছে। তাঁর যৌবন কেটেছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের এক সংকটকালে। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময়ে তিনি ছিলেন 'উত্তেজনামুক্ত তরুণ যুবক, যার একমাত্র বিনোদন পাবলিক লাইব্রেরিতে গল্পের বই পড়া। শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে চা খাওয়া, মাঝে-মধ্যে বাংলা একাডেমীতে উঁকি দেয়া। সেখানে প্রায়ই গানের আসর হতো। ... বাইরে যখন ভয়াবহ আন্দোলন চলছে' তখন তিনি 'দরজা বন্ধ করে গান' শুনেছেন। কিন্তু রাজনীতি থেকে শত হাত দূরে থাকা এই যুবকের জীবনে অনিবার্যভাবে যখন মুক্তিযুদ্ধের তাপ এসে

লাগল তখন তাঁর জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা গেল বদলে। তাঁর 'সাজানো অতি পরিচিত ভুবন পুরোপুরি ভেঙে পড়ল ১৯৭১ সনে।' হুমায়ূন আহমেদের এর পরের নয় মাসের জীবন ভাইবোন-মা নিয়ে নিরাপদ স্থান খোঁজার জীবন, জীবন নিয়ে দুঃসহ উৎকণ্ঠায় প্রহর গোনার জীবন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঢাকা থেকে বরিশাল, বরিশাল থেকে জন্মস্থান নেত্রকোনায় ছোটাছুটি, কখনো কখনো হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়া, দুর্বিষহ শাস্তি ভোগ, মানুষের কাছ থেকে নির্মম আচরণের শিকার— এসবের মধ্য দিয়ে কেটেছে হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস। শুধু তাই নয়, প্রাণ বাঁচানোর জন্য সর্ষিনার পীরের মাদ্রাসায় ভর্তি হতে গিয়ে সেখানেও আশ্রয় পাননি হুমায়ূন এবং তাঁর ভাই। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান তাঁর দেশপ্রেমিক বাবা। ফলে, মুক্তিযুদ্ধ হুমায়ূন আহমেদের কাছে ধরা দিয়েছে অর্জন, বিসর্জন, সংকট, উত্তরণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক বাস্তবতাসহ। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধ তাঁর পরবর্তী জীবনে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর প্রমাণ নিহিত রয়েছে সমগ্র লেখক-জীবনব্যাপী ছোট ছোট বিরতিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস রচনার মধ্যে।

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের সংখ্যা আট। এটাই মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি করে রচিত একক ব্যক্তির সর্বাধিক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এক অবিরল, নিরন্তর আবেগ আর ভালোবাসার এ-এক বিরল দৃষ্টান্ত। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা কোনো জাতির একজন ঔপন্যাসিক তাঁর স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে এতগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। উল্লেখ্য যে, সাতটি উপন্যাস রচনার পরও তাঁর তৃষ্ণা মেটেনি। তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন তাঁর কথাগুলো বলতে পারেননি। বিরাট ও সম্পূর্ণ অবয়বে মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস না লেখা পর্যন্ত তিনি তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনকে মনে করেছেন অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করাকে তিনি মনে করতেন 'দেশমাতার ঋণ শোধ' করা। হুমায়ূনের ভাষায় —

> মানুষকে যেমন পিতৃঋণ-মাতৃঋণ শোধ করতে হয়, দেশমাতার ঋণও শোধ করতে হয়। একজন লেখক সেই ঋণ শোধ করেন লেখার মাধ্যমে (ভূমিকা, *জোছনা ও জননীর গল্প*; হুমায়ূন, ২০১২ : ৩৭২)।

হুমায়ূন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে সেই দেশ-মায়ের ঋণ শোধ করেছেন বলে তিনি মনে করতেন। হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আটটি উপন্যাস হচ্ছে — *শ্যামল ছায়া* (১৯৭৪), *নির্বাসন* (১৯৭৪), *সৌরভ* (১৯৭৮), *আগুনের পরশমণি* (১৯৮৬), ১৯৭১ (১৯৮৬), *সূর্যের দিন* (১৯৮৬), *অনিল বাগচীর একদিন* (১৯৯২) এবং *জোছনা ও জননীর গল্প* (২০০৪)। আগেও একবার বলা হয়েছে এবং আবারও বলে রাখা ভালো যে, এসব উপন্যাসে হুমায়ূন মহৎ কোনো জীবনচেতনা এবং রাষ্ট্রচেতনাকে ধারণ করেননি। দীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের রাষ্ট্র-বাসনার রূপরেখাও তিনি হাজির করেননি। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের কঙ্কালের ওপর মানবিক সম্ভাবনার শব্দভাষ্য নির্মাণ করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের উদ্দেশ্য-আদর্শ এবং ঐতিহাসিকতা নিয়ে যা বলেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—

> জোছনা ও জননীর গল্প কোন ইতিহাসের বই না, এটা একটা উপন্যাস। ... সে বড় অদ্ভুত ছিল। স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র এক জগৎ। সবই বাস্তব, আবার সবই অবাস্তব। আমি সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর সুররিয়ালিস্টিক সময় পার করে এসেছি। তার খানিকটাও যদি ধরে থাকতে পারি, তাহলেই আমার মানবজীবন ধন্য (হুমায়ূন, ২০১২ : ৩৭৩)।

জোছনা ও জননীর গল্প সম্পর্কে ঔপন্যাসিক যে-কথা বলেছেন, তা তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সব উপন্যাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

তিন

এ-যাবৎ রচিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের যদি এক কথায় মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে বলতেই হবে যে, খুব বড় ব্যতিক্রম ছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকরা প্রধানত মেলোড্রামা তৈরি করেছেন। শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের শিল্প-প্রকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, 'তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। সেজন্য তার উপন্যাসে যথেষ্ট উত্তাপ আছে। অনেক সময় তার রচনাকে শিল্পিত রূপ প্রদান করতে গিয়ে তা মেলোড্রমার পর্যায়ে পৌঁছেছে' (শহীদ ২০১০ : ১৭৯)। শুধু শওকত ওসমান নন, প্রায় সব ঔপন্যাসিকই মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের বর্ণনার ভাষা ও ঘটনা বর্ণনাকে সব সময় তারায় চড়িয়ে রেখেছেন। কিন্তু 'গান করতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে, কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন নিয়ম থাকা উচিত নয়' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৯৫)। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক উপন্যাসে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক সেই কাজটি করেছেন। বিরতি নেই, স্বস্তি নেই। দম বন্ধ অবস্থা। কিন্তু হুমায়ুন সে ফাঁদে পা দেননি। তিনি এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তিনি উপন্যাস লিখছেন। তিনি শিল্পী। লোহা খেয়ে তাকে হজম করতে হয়। এজন্যেই হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে দেখি, তাঁর যেন তাড়া নেই। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর যতটুকু দরদ এবং মনোযোগ, অপরাপর বিষয়ের প্রতিও তাঁর সমান দরদ এবং মনোযোগ। এ কারণে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লিখলেও ওই উপন্যাসের মধ্যেই 'মেঘভাসা রোদ', 'দীঘির জলে আকাশের ছায়া', গাছের মাথায় রোদের 'সোনার টোপর' ইত্যাদির নান্দনিক উপভোগকে জারি রাখেন। নানা ধরনের প্রোভোগ হুমায়ূনের মূলধারার উপন্যাসের এক বড় অংশ জুড়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের মধ্যে ভোগ-উপভোগ এবং নান্দনিক অনুভূতির সঞ্চার করানো — এ যে কত বড় নিরাসক্তি, কত বড় শিল্পগুণ, তা উপন্যাসের শিল্প-সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন। আবার এসব উপভোগ্য ও হালকা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মিলিটারি ঠিকই হানা দিচ্ছে জিপ নিয়ে। উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। অন্যান্য ঔপন্যাসিক মোটা মোটা বড় বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি তাণ্ডবের বর্ণনা দেন। কিন্তু হুমায়ূন ছোট্ট ছোট্ট রেখায় বৃহতের ইশারাময় ছবি আঁকেন। মর্ম-ছেঁড়া বর্ণনা দেন। হুমায়ূন পাকিস্তানি তাণ্ডবের কথা বোঝাতে পাঠককে শুধু মনে করিয়ে দেন, রাস্তায় শিশুদের কোলাহল-খেলাধুলা নেই, কুকুর নেই, নেই ভিখিরিও। সুন্দর পার্কে মানুষ নেই, হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে কোনো মানুষ চলাফেরা করে না রাস্তায়। এই বর্ণনাকে আমরা বলব এক কথায় শিল্পিতার চূড়ান্ত। শব্দের এমন নিঃশব্দ অথচ আকাশ-ফাটানো উপস্থাপন আর কী হতে পারে আমাদের জানা নেই।

একাত্তরে তো কেবল মুক্তিযোদ্ধা আর পাক-হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ হয়নি; আরো নানা জটিলতা ছিল জন-মানসে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন চারদিকে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবও দেশময় নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তো কেবল নারীর সতীত্বের বিসর্জন আর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জীবন বিসর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হুমায়ূন এই আরো নানা বিষয়কে ধীরে-সুস্থে, কোন প্রকার তাড়াহুড়ো ছাড়াই, উপন্যাসের শরীরে স্থান দিতে পেরেছেন— যে-কাজটা করতে অন্যরা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছেন। বাঙালি এবং পাকিস্তানির মধ্যেকার যুদ্ধে নানাজন নানা হিসাব-নিকাশ করেছে। যেমন, অনেকেই পাকিস্তানের এই তাণ্ডব চায়নি; মানবিক কারণে নয়, বাণিজ্যিক কারণেই চায়নি। যেমন, *অনিল বাগচীর একদিন* উপন্যাসের জোবায়েদ সাহেব; যিনি ১৯৫০ সালে বিহার থেকে মোহাজের হয়ে ঢাকায় আসেন। ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি করেছেন। সম্পত্তি করেছেন ঢাকায়, সিলেটে, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। তার হিসাব-কিতাব, টেনশন, যুদ্ধ-ভাবনা আর অন্যদের মতো এক না। তার যুদ্ধ-সম্পর্কিত উদ্বেগের সঙ্গে মানবিক বিপর্যয়-ভাবনার কোনো সম্পর্ক নেই। তার উদ্বেগ সম্পদ রক্ষা করতে পারা না-পারা আর ব্যবসায়িক ধসের সাথে জড়িত। আবার এমন অনেক বাঙালিও তো ছিল যারা পাকিস্তানিদের সহযোগী নয়, কিন্তু তারা চেয়েছে পাকিস্তানি তাণ্ডব আরো দীর্ঘস্থায়ী হোক। কারণ এতে তার লবণ আর মোমবাতির ব্যবসায় পোয়া বারো হয়েছে। *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসের মুসলেম উদ্দিন নামক বাঙালি চরিত্রের একটি ভাষ্য লক্ষ করা যাক—

> গণ্ডগোলের বাজারে আমার ব্যবসা ভালো যাচ্ছে। ভালো পয়সা কামাচ্ছি। ... লবণের ব্যবসা আর মোমবাতির ব্যবসা। কেরোসিনের ব্যবসাতেও রমরমা ভাব। শুধু আল্লা আল্লা করতেছি। গণ্ডগোল আরও কিছুদিন চলুক। দুই মাস চললেই আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর (হুমায়ূন, ২০১২ : ৪৩৬)।

আবার, এমন অনেক বাঙালিও ছিল যারা পাকিস্তানি ভয়াবহতার শিকার , তবু পাকিস্তানের প্রতি তার সীমাহীন দরদ এবং বাঙালির পরাজয় তার কাছে আনন্দ ও উৎসবের মতো। ঢাকার ওই একই বাড়িতে আশ্রয় নেয়া আরেক তরুণী-গৃহিণী— যে কিনা স্বামীর সাথে রাগ করে ২৪ মার্চ বাড়ি ছেড়ে বান্ধবীর বাসায় এসে উঠেছে এবং ২৬ মার্চ পর্যন্ত স্বামীর কোনো সন্ধান পাচ্ছে না বা স্বামীর সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না— তার ভাবনাও তো ভিন্ন। এই দুইজনের কথোপকথন এবং ঔপন্যাসিকের মনোভাবের একটি পরিচয় নেয়া যাক—

> বসার ঘরে মোতালেব সাহেব বসেছিলেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। দেখে মনে হয় তিনি বেশ আনন্দে আছেন। ... আসমানীকে দেখে মোতালেব সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, লেটেস্ট খবর জানো নাকি মা?
> আসমানী বলল, জানি না চাচা।
> বাঙালি জাতির হাগা বের করে দিয়েছে। এখন তো যাকে বলে বেড়াছেড়া অবস্থা।
> আসমানী বলল, জি।
> এখন ধরে নিতে পার বাঙালি খতম। আর পাঁচ বছর পরে দেখবে সবাই উর্দুতে বাতচিৎ করছে। চারদিকে হাম করেঙ্গা, তুম করেঙ্গা।

> আসমানী আবারও বলল, জি। তার এখন কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। শেক সাহেব ধরা পড়লে পড়ুক, বাঙালি জাতি উর্দুতে কথা বললে বলুক— তার এখন দরকার তার স্বামীকে। আর কিচ্ছু দরকার নেই। সে প্রতিজ্ঞা করল, বাকি জীবনে সে আর কখনই রাগ করে শাহেদকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। ভয়ঙ্কর রাগারাগি হোক, শাহেদ তার গায়ে থুথু দিক— তারপরেও না (হুমায়ূন, ২০১২ : ৪৯৪-৪৯৫)।

এভাবে যুদ্ধের অভিঘাতে দ্রুত বদলে যাচ্ছিল চারপাশ; দেখা দিচ্ছিল অভিনব, অভাবিত সব বৈচিত্র্য। হুমায়ূন দক্ষতা ও মর্ম-ছেঁড়া নিরাসক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন এসব পরিবর্তন এবং বাস্তবতাকে রূপায়িত করেছেন তাঁর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোতে। হুমায়ূন আহমেদ নিজে যেকোনো বিষয়কে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করেন—

> আমরা যখন কোনো কিছু চিন্তা করি, এক জায়গাতে বসে চিন্তা করি। ওখান থেকে একটু সরে এলেই সমস্ত পারস্পেকটিভ বদলে যায়। একজন লেখকের নিশ্চয় সব সময় চেষ্টা থাকবে, সব ধরনের পারস্পেকটিভ থেকে জিনিসটা দেখার (উদ্ধৃত, শাহরিয়ার, ১৯৯২ : ১৭)।

এ-কারণেই হুমায়ূন আহমেদ এইসব জোবায়েদ, মুসলেম উদ্দিন, মোতালেব সাহেব, আসমানীদের মনোভাবনাকে তাঁর উপন্যাসে দারুনভাবে অ্যাড্রেস করতে পেরেছেন। হুমায়ূন আহমেদের এই কৃতিত্ব মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য উপন্যাসের ঔপন্যাসিকরা এতটা সফলতার সাথে করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

হুমায়ূন মুক্তিযুদ্ধের বিবরণকে কেবল মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি যুদ্ধের পাশাপাশি নজর দিয়েছেন জনজীবনের দিকে। যুদ্ধের মধ্যে, গোলাগুলির মধ্যে তো শুধু বীভৎসতা, বিপর্যস্ততা আর ভয়ংকরতা থাকে না। বিপর্যয় তো বোঝা যায় প্রাত্যহিক জীবনের চালচিত্রের মধ্যেও। যুদ্ধকে যুদ্ধ দিয়ে বোঝানোর পাশাপাশি গৃহস্থের চুলার খবর দিয়ে বুঝিয়েছেন তিনি। যেমন, ১৯৭১ উপন্যাসে এলাকা যখন হানাদার বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত, তখন বৃদ্ধ মীর আলির ভাবনায় ঔপন্যাসিক বললেন, 'যা ভাবসাব তাতে মনে হচ্ছে, আজ আর রান্না হবে না' (হুমায়ূন, ২০১২ : ১১০)। এই বাক্য হানাদার বাহিনীর হাজার রাউন্ড গুলির চেয়ে ভয়ংকর। অথবা নিচের উদ্ধৃতিটি লক্ষ করা যাক; বর্ণনাটি ২৬ মার্চের ঢাকার রাস্তার—

> সে (শাহেদ) রিকশার খোঁজে হেঁটে হেঁটে রেলগেট পর্যন্ত আসার পর চোখে পড়ল তিনজন মিলিটারির দল। ... তাদের একজন হাত ইশারায় তাকে ডাকছে। কেন তাকে ডাকছে? সে চোখে ভুল দেখছে না তো?
> না, তাকে ডাকছে না। তার কী করা উচিত? সে কি মিলিটারিটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসবে? সেটাও মনে হয় ঠিক হবে না। হাসির অন্য অর্থ করে ফেলতে পারে। তার উচিত এই জায়গা থেকে অতি দ্রুত সরে পড়া। অতি দ্রুত সরাটাও ঠিক হবে না। মিলিটারিরা ভাবতে পারে লোকটা এত দ্রুত যাচ্ছে কেন? নিশ্চয় খারাপ লোক (হুমায়ূন, ২০১২ : ৪৯৭-৪৯৮)।

এই লাইনগুলো নিঃশব্দ কিন্তু নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর। নৈঃশব্দ্য দিয়ে হুমায়ূন তাঁর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোতে শব্দকে, ভয়ংকরকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং পেরেছেনও। 'আশ্চর্য

নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা' বলার এই শিল্প-সংযম হুমায়ূনকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখিত উপন্যাসের প্রথম যথার্থ ও সার্থক রূপকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হুমায়ূন মুক্তিযুদ্ধকে কোনো রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের আওতায় আনেননি। আনতে চানওনি। মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট, অর্জন এবং বিসর্জন এসব তিনি বিবেচনায় আনেননি। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে নিয়েছিলেন মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে ঠিকই; কিন্তু এর চেয়েও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন যুদ্ধকালীন বাঙালি জীবনের নানা সংকটকে। এই সংকটগুলোকে হুমায়ূন দারুণ মানবিক করে তুলেছেন। মানবিক করে তুলতে গিয়ে তিনি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের টেকনিকগুলোকে ব্যবহার করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেকার ছোটখাটো সুখ-দুঃখের সরল বয়ান হাজির করে পাঠককে কান্নাহাসির দোলায় দোলানো হুমায়ূনের উপন্যাসের একটা বড় কৌশল। এই টেকনিকটিকে হুমায়ূন তাঁর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসেও ব্যবহার করেছেন। ব্যবহার করে উপন্যাসের সারা শরীরে মানবিক কান্না-হাসির প্রলেপ মেখে দিয়েছেন। *শঙ্খনীল কারাগার* (১৯৭৩) উপন্যাসে ব্যবহৃত পারিবারিক আবেগের আতিশয্য সম্পর্কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন— 'শঙ্খনীল কারাগার' পড়ার সময় মনে হয় যে আবেগ অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়েছে' (উদ্ধৃত, শাহরিয়ার, ১৯৯২ : ৫৩)। অর্থাৎ হুমায়ূনের উপন্যাসে আবেগ একটি ব্যবহারের বিষয়। এই আবেগ ব্যবহারের আবার মাত্রাও আছে বলে হুমায়ূন মনে করেন। হুমায়ূনের অন্যান্য মূলধারার উপন্যাস থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের পার্থক্য এ-জায়গায় যে, অন্যান্য উপন্যাসে কান্না-হাসি-টেনশন-বিপর্যয় আসে সাধারণ বাস্তব জীবনের ঘটনার আঘাতে; আর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে মানবিক হাসি-কান্না-বেদনা এসেছে যুদ্ধের তাপে-চাপে। কারণের হেরফের হয়েছে মাত্র, কার্য ঠিকই আছে। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যেকোনো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসকে দাঁড় করানো যাবে। *অনিল বাগচীর একদিন* অথবা ১৯৭১ অথবা *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। অনিলের অতীত পারিবারিক জীবন, বদিউজ্জামান ও মীর আলির পারিবারিক জীবন বা জীবনের রূপায়ণ আমাদের উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, হুমায়ূন নিজে ২৩ বছরের যুবক থাকাকালে ১৯৭১ সালে সপরিবার পালিয়ে বেড়ানোর সময় যে অমানবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই সাহিত্যিক রূপ হচ্ছে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো। হুমায়ূন যদি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এবং উপন্যাস লিখতেন, তাহলে তাঁর উপন্যাসে হয়ত জীবনবোধের রূপান্তর দেখা যেত। পরিবারসহ সম্মিলিত সংকটের মধ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলো পারিবারিক মানিবক সংকটের আবর্তেই ঘুরপাক খেয়েছে। তাতে বড় রকমের রাজনৈতিকতার সমাবেশ ঘটেনি। হমায়ূন তা করতেও চাননি।

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাতটি উপন্যাসেই চিত্রিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড-চিত্র। এই সাতটি উপন্যাসকে বলা যায় হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক বৃহৎ উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, শিল্প-প্রকরণগত দিক থেকে এই সাতটি উপন্যাসের প্রায় সবকটিই নিখুঁত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ কারণে, ১৯৭১ উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর হুমায়ূন আহমেদ গ্রন্থটি জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে পড়তে দিলে আব্দুর রাজ্জাক উপন্যাসের ক্ষুদ্র আয়তন দেখে হতাশ হয়েছিলেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের মতো এত

মহৎ এবং বৃহৎ বিষয় নিয়ে লিখিত উপন্যাসের আয়তন এত ছোট হয় কীভাবে। কিন্তু উপন্যাসের নিরাসক্ত শিল্প-মহিমা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং হুমায়ূন আহমেদকে বলেছিলেন, 'তুমি পেরেছ'। এ উপন্যাস সম্পর্কে আনিসুজ্জামানও বলেছেন, এটি 'অসাধারণ সংযত রচনা' (আনিসুজ্জামান, ২০১২ : ১০)। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম সাতটি উপন্যাসে বিরল শিল্পসাফল্য থাকলেও, এসব উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের একেকটি খণ্ড চিত্রই রূপায়িত হয়েছে। অবশেষে তিনি রচনা করলেন মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ উপন্যাস *জোছনা ও জননীর গল্প* । এই উপন্যাসে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক রূপচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন; যাকে আনিসুজ্জামান বলেছেন 'পক্ষবিস্তারী উপন্যাস'। উপন্যাসটিতে হুমায়ূন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ইতিহাসের সত্যকে জীবনের সত্যে পরিণত করার। এই কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। ইতিহাস নিয়ে— বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে— যারাই উপন্যাস লিখতে গিয়েছেন, তারাই এই ইতিহাসকে জীবনের সত্যে রূপান্তরের জটিলতাটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ এই কাজটা— আমরা মনে করি— অত্যন্ত সফলতার সাথে করেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ ইতিহাস ও কল্পনার আনুপাতিক সম্পর্ক-রক্ষায় ঈর্ষণীয় সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের সত্য আর কল্পনার বাস্তবতা এ উপন্যাসে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে— কোনটি ইতিহাস আর কোনটি কল্পনা, তা পাঠকের কাছে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে কল্পনার সত্যের এই জৈব-ঐক্য মিলনই আলোচ্য উপন্যাসের শৈল্পিক সার্থকতার প্রধান শক্তি-উৎস (বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ২০২)।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য উপন্যাসে যখনই ইতিহাসকে জীবনের মধ্যে জীবন্ত করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিকরা, তখনই তা মেকি এবং আরোপিত মনে হয়েছে, যান্ত্রিক মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলোর সঙ্গে ইতিহাসের বাস্তবতা অনিবার্যভাবে, জৈবিকভাবে জড়িত নয়। ঔপন্যাসিককে ইতিহাসের চাকর, ভাড়াটিয়া বা উকিল মনে হয়েছে। কিন্তু *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসেই শুধু নয়, হুমায়ূনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সব উপন্যাসে জীবনই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলোর জীবনে মুক্তিযুদ্ধ যেন স্বাভাবিক এবং অনিবার্যভাবে সংকট তৈরি করেছে। এ কারণে *জোছনা ও জননীর গল্প* পড়তে গিয়ে প্রথমে দীর্ঘ সময় যাবৎ সংশয়ের মধ্যে থাকতে হয়, এটি কি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস, নাকি হুমায়ূনের অপরাপর উপন্যাসের মতোই মধ্যবিত্তের কান্না-হাসির দোলায় দোলানো গার্হস্থ্য উপন্যাস। অর্থাৎ হুমায়ূন সাধারণ গার্হস্থ্য বা পারিবারিক বা জনজীবনকে তাঁর উপন্যাসে অনেকখানি জায়গা দিয়েছেন। আগে স্বাভাবিক জীবন, তারপর মুক্তিযুদ্ধ। এমন কি তিনি মুক্তিযুদ্ধকে পারিবারিক সংকট মীমাংসার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হননি। যেমন, আসমানী ও শাহেদের মধ্যেকার দূরত্ব দূর হয়েছে তখনই, যখন ২৫ মার্চ রাতের পর তাদের উভয়ের জীবনই সংকটের মধ্যে পড়েছে (দ্রষ্টব্য, *জোছনা ও জননীর গল্প*)। ফল হয়েছে, এই শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধই প্রধান হয়ে উঠেছে তার নিজস্ব তাৎপর্যের কারণে, ব্যাপকতার কারণে। আবার সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনও সমুচিত গুরুত্ব লাভ করেছে। এ-উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জন-জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের যে মিশেল ঘটিয়েছেন তা বিস্ময়কর। তিনি প্রাত্যহিক জীবনের ধারাবাহিকতার

মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এমন কি পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যন্ত হুবহু চারিয়ে দিয়েছেন। অথচ কোথাও এতটুকু আরোপিত মনে হয়নি। এক্ষেত্রে হুমায়ূনকে সাহায্য করেছে তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা নামক গুণটি; যে গুণটির কথা তাঁর নিন্দুকরাও স্বীকার করেন। *জোছনা ও জননীর গল্প* হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের কথক সত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ। এই গুণটিই উপন্যাসটিকে বাংলাসাহিত্যের মুক্তিযুদ্ধের অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাস করে তুলেছে। *জোছনা ও জননীর গল্প* বাস্তব আর ইতিহাসের এক অপূর্ব রসায়ন। বাংলাদেশের অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকরা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সাধারণ মানবিক জীবনকে খাটো করেছেন। সেখানে মুক্তিযুদ্ধ অতিমাত্রায় আদর্শায়িত। আবার জীবন্ত গল্পের অভাব। ফলে তা উপন্যাস না হয়ে, সাহিত্য পদবাচ্য না হয়ে, হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের বীভৎসতার রোজনামচা বা গদ্য-বিবরণ।

সমগ্রতার প্রশ্নে *জোছনা ও জননীর গল্প* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়েছে। বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে এই সামগ্রিকতা এসেছে। উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, গণ-মাধ্যম, সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক রাজনীতি। এই বহুমাত্রিক সচেতনতা থেকে বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস এই প্রথম। এছাড়া আছে বৃহত্তর জনজীবন। ১৯৬৯-এ ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে শুরু হয়েছে এ-উপন্যাস। এরপর থেকে বাংলার জনজীবনে যত পরিবর্তন হয়েছে তার প্রতিটি তরঙ্গতেই নজর দেয়ার চেষ্টা খুব সহজেই চোখে পড়ে। এছাড়া ১৯৭১-এর ৭ মার্চের পর থেকে ক্রমাগত কীভাবে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যবসায়, চায়ের স্টল, পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল তাঁর এক দারুণ নির্মোহ আলেখ্য অঙ্কন করেছেন হুমায়ূন এ উপন্যাসে। সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীনতার আলাপ ছড়িয়ে পড়ছিল; সমগ্র জনগোষ্ঠী কীভাবে ক্রমাগত রাজনৈতিক হয়ে উঠছিল তার এক সূক্ষ্মদৃষ্টি উপন্যাসটিকে অনন্য মর্যাদার অধিকারী করে তুলেছে। মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ার বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক বড় কোনো রাজনৈতিক গোলটেবিল থেকে পাঠককে বোঝাতে চাননি; তিনি বিষয়টি বোঝানোর জন্য আশ্রয় করেছেন পথঘাটের সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা লক্ষ করা যাক—

> বড় বড় উৎসবের আগে আগে এই ঘটনাগুলো ঘটে। ঠিক এই রকম ব্যাপার এখন ঘটছে। যে দোকানে চাল-ডাল কিনতে যাচ্ছে তাকে নিতান্ত অপরিচিত মানুষ অন্যদের সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছে— কেরোসিন বেশি করে কিনে রাখেন। কেরোসিনের শর্টেজ হবে। কেরোসিন, দেয়াশলাই আর মোমবাতি।
>
> চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে পাশ থেকে কেউ একজন অবধারিতভাবে জিজ্ঞেস করবে, ভাইসাহেব, দেশের অবস্থা কী বুঝেন? দেশ কী স্বাধীন হবে— আপনার কী ধারণা? দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা চলে। ... এক সময় আলোচনা ঐকমত্যে শেষ হয়। দেশ যে স্বাধীন হবে— এই বিষয়ে সবাই এক শ ভাগ নিশ্চিত হয় (হুমায়ূন, ২০১২ : ৪৪৫-৪৪৬)।

ঢাকার শুধু নয়, সারা দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন, আচরণ-উচ্চারণের মধ্যে কীভাবে রাজনীতি ঢুকে পড়ছিল তাঁর নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন হুমায়ূন তাঁর *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে। উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে শাহেদ। তাঁর স্ত্রীর কাছে রাজনীতির চেয়ে ঘরনীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই স্ত্রীও যখন তার স্বামী শাহেদের সঙ্গে কথা বলছে তখন তার অজান্তেই ঢুকে পড়েছে রাজনীতি। শাহেদের স্ত্রী আসমানীর একটি সংলাপ—

> মুখটা এমন প্যাঁচার মুখের মতো করে রেখেছ কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। পাকিস্তানের সমস্যায় হতাশ, বিরক্ত ও ক্লান্ত। আমি লক্ষ করছি ভোরবেলাতেই তোমার মেজাজ থাকে বেশি খারাপ (হুমায়ূন, ২০১২ : ৪৭০)।

এভাবে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর *জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের শূন্যতা অনেকাংশে পূরণ করেছেন।

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হুমায়ূন আহমেদই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা। *জোছনা ও জননীর গল্প*-এর মতো উপন্যাস রচনা করে তিনি কেবল 'দেশমাতার ঋণ শোধ' করেননি, ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি নিজেকে উন্নীত করেছেন এক নতুন উচ্চতায়। সাথে সাথে এও স্মরণ রাখা দরকার যে, দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গণ-মনে যে রাষ্ট্রবাসনা আদলপ্রাপ্ত হয়েছিল— উত্তর-প্রজন্মের লেখক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে সেই রাষ্ট্রবাসনার কোনো কাতরতা লক্ষ করা যায় না। হয়ত হুমায়ূনের লেখক-মানসের মধ্যে এই রকম রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক কাতরতা নেই। নেই কেন? এই না থাকার সঙ্গে বোধ করি স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের খাসলতের কোনো সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। কারণ, ঔপন্যাসিক এবং তাঁর চেতনাজগৎ তো আর আসমান থেকে আসে না। দেশ যেমন তার ঔপন্যাসিকও তেমন। হুমায়ূন তো এই রাষ্ট্রেরই তেলে-জলে মানুষ। তবে এটি ভিন্ন তর্ক। হুমায়ূনের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে এই তর্কটা তোলা বোধ হয় এখন খুবই জরুরি। এতে আমরা হুমায়ূনকেও বুঝতে পারব, নিজেদেরও বুঝতে পারব।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আনিসুজ্জামান (২০১২)। 'তুমি রবে নীরবে'। *অন্যদিন*, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১৪, (সম্পা. মাজহারুল ইসলাম), ঢাকা।

আহমদ ছফা (২০০৭)। 'একাত্তর : মহাসিন্ধুর কল্লোল'। *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, ১ম খণ্ড*, (সম্পা. সলিমুল্লাহ খান), অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

প্রমথ চৌধুরী (১৯৮৬)। *প্রবন্ধসংগ্রহ* , বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২)। *লোকপুরাণ জনসমাজ ও কথাশিল্প*, নান্দনিক, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* ,বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শহীদ ইকবাল (২০১০)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

শাহরিয়ার কবির (১৯৯২)। *অন্তরঙ্গ হুমায়ূন আহমেদ*, সুবর্ণ, ঢাকা।

শেখ ফিরোজ আহমদ (১৯৯১)। 'শওকত ওসমানের জলাংগী : ট্রাজিক সেক্রিফাইস'। *নিসর্গ*, শওকত ওসমান সংখ্যা (সম্পা. সরকার আশরাফ), ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান (২০০৭)। 'ছফাচন্দ্রিকা'। *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, ১ম খণ্ড* (সম্পা. সলিমুল্লাহ খান), অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান (২০০৭)। 'রাষ্ট্র ও বাসনা : আহমদ ছফার বিষাদ-সিন্ধু'। *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, ১ম খণ্ড* (প্রাগুক্ত)।

সৌমিত্র শেখর (২০০৮)। 'উপন্যাস নিয়ে শওকত ওসমানের মুখোমুখি'। *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* (সম্পা. বুলবন ওসমান), দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক (১৯৯৪)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৯)। *সাক্ষৎকার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ূন আহমেদ (২০১২)। *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।